বিগ ব্যাং থেকে
হোমো স্যাপিয়েনস

মুহম্মদ জাফর ইকবাল








বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েনস

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

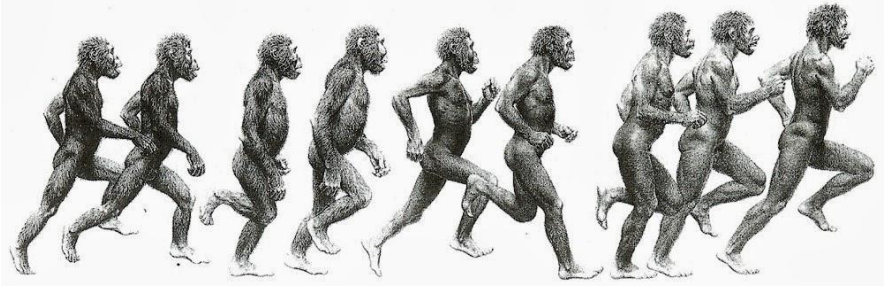

উৎসর্গ

আলী ইমাম শ্রদ্ধাস্পদেষু

(আমি গোপনে যার মতো হওয়ার চেষ্টা করি)



রাতের আকাশে রয়েছে নক্ষত্র এবং নক্ষত্র। ভালো করে লক্ষ করলে আমরা ছায়াপথটি দেখতে পাব, সেটি হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সি।

রাতের আকাশ

আমরা যদি রাতের আকাশের দিকে তাকাই সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রকে ঝিকিমিকি করতে দেখি। পৃথিবীতে একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নাকী রাতের আকাশের সেই অসংখ্য মিটি মিটি তারা দেখে অবাক হয়নি। একজন পাওয়া যাবে না যে নাকী অবাক হয়ে ভাবেনি এই তারাগুলো কতদূরে? কোথা থেকে এসেছে? কেন এরকম মিট মিট করে জ্বলছে?

আকাশে যখন চাঁদ নেই, মেঘ নেই তখন সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে আকাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় অসংখ্য নক্ষত্রকে কুয়াশার সাদা চাদরের মতো বিস্তৃত হয়ে থাকতে দেখি। এটি হচ্ছে ছায়াপথ, আমাদের গ্যালাক্সি। আমরা এই গ্যালাক্সির ভেতর থেকে এটাকে দেখি বলে এটাকে কুয়াশার সাদা চাদরের মতো কিংবা এরকম ধূসর একটি পথের মতো দেখায়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

অসংখ্য নক্ষত্র, গ্যাস, ধুলাবালি যখন মহাকর্ষ বলে একসাথে আটকে থাকে সেটাকে আমরা বলি গ্যালাক্সি। আমরা আমাদের গ্যালাক্সির ভেতরে থাকি বলে সেটাকে বাইরে থেকে দেখতে পাই না। কিন্তু যদি আমরা শরৎকালে কিংবা শীতকালে আকাশের দিকে তাকাই তাহলে আমরা আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি এনড্রোমিডাকে দেখতে পাব। যদি আমরা টেলিস্কোপে তাকাই তাহলে শুধু এনড্রোমিডা নয় আরো অনেক গ্যালাক্সিও দেখতে পাব। যদি আরো

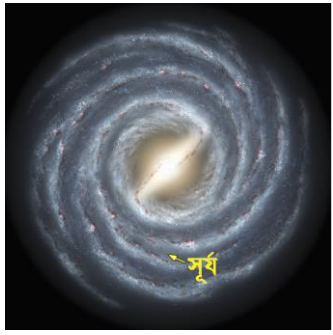

আমাদের গ্যালাক্সিটা এরকম, এর মাঝে সূর্য গ্যালাক্সির মাঝামাঝি একটা নক্ষত্র।



আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি এনড্রোমিডা, আমাদের থেকে 2.5 মিলিওন আলোকবর্ষ দূরে।



মহাকাশের গভীরে আমরা যতদূরে তাকাই, দেখতে পাব শুধু গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সি। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে প্রায় একশ বিলিওন নক্ষত্র। আমাদের কাছে দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে এরকম প্রায় ট্রিলিওন গ্যালাক্সি।

ভালো টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের আরো গভীরে তাকাই তাহলে দেখব আরো অনেক গ্যালাক্সি। এক কথায়, মনে হবে গ্যালাক্সির বুঝি কোনো শেষ নেই। অনুমান করা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, সেখানে প্রায় এক ট্রিলিওন গ্যালাক্সি রয়েছে। (যারা মিলিওন, বিলিওন কিংবা ট্রিলিওন ব্যবহার করে অভ্যস্ত নয়, যারা লক্ষ এবং কোটিতে সংখ্যা প্রকাশ করে অভ্যস্ত তাদের জন্যে মনে করিয়ে দেয়া যায়, এক মিলিওন হচ্ছে দশ লক্ষ আর এক বিলিওন হচ্ছে একশ কোটি। কিংবা অন্যভাবে, হাজারটি হাজার হচ্ছে মিলিওন, হাজারটি মিলিওন হচ্ছে বিলিওন এবং হাজারটি বিলিওন হচ্ছে ট্রিলিওন। এর সাথে আরো একটা বিষয় তাদের মনে করিয়ে দেয়া যায়, বিজ্ঞানের জগতে কিন্তু হিসেব নিকেশের ভাষা

মিলিওন, বিলিওন, ট্রিলিওন। সেটাতে যত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া যায় তত ভালো।)

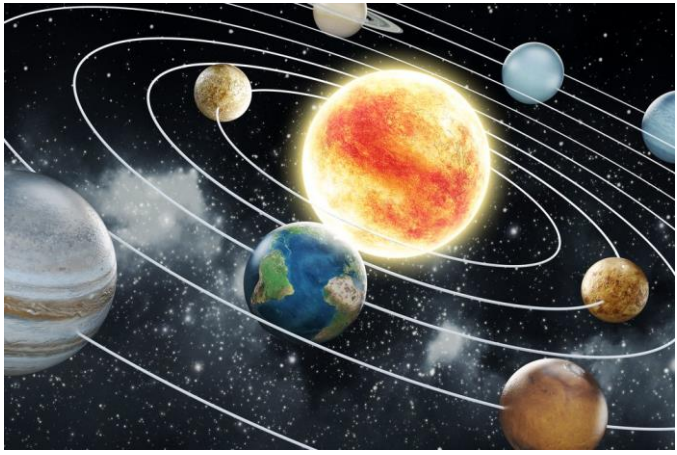

চন্দ্র সূর্য পৃথিবী কিংবা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করার জন্য নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র $F = GMm/r^2$ সূত্রটিই যথেষ্ট।

গ্যালাক্সির গতিবিধি

স্বাভাবিকভাবেই আমরা জানতে চাই এই গ্যালাক্সিগুলো কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? কীভাবে এসেছে? আমাদের পরিচিত চাঁদ, সূর্য, গ্রহ এগুলোর গতিবিধি ব্যাখ্য করার জন্যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রই যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই গ্যালাক্সিগুলোর গতিবিধি ব্যাখ্যা করেছে যে সূত্র সেটি হচ্ছে আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। প্রথম যখন সেই সূত্রের সমাধান করা হলো দেখা গেল সেটি বলছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে পারে। আইনস্টাইন ভাবলেন সেটি কেমন করে হতে পারে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়ই নিজে



বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিলিওন বিলিওন গ্যালাক্সির গতিবিধি ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রয়োজন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। ছবিতে আইনস্টাইনের পিছনে পাইপ মুখে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল।

নিজে প্রসারিত হতে পারে না, তাই মহাকর্ষ বলে আকর্ষিত হয়ে সব গ্যালাক্সি যেন একজায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায় সে জন্যে তিনি তার সূত্রের মাঝখানে একটা মহাজাগতিক ধ্রুব সংখ্যা এক রকম জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন, সেটির কাজ হচ্ছে মহাকর্ষ বলের আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্যালাক্সি একজায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায়। আইনস্টাইন তখনো জানতেন না জোর করে এই মহাজাগতিক ধ্রুব ঢোকানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসলেই প্রসারিত হচ্ছে, তাই মহাকর্ষ বলে আকর্ষিত হয়ে সব গ্যালাক্সি কখনোই একজায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে না!

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R\, g_{ab} + \Lambda\, g_{ab} = \kappa\, T_{ab}$$

আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির সমাধানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হওয়ার কথাটি ছিল। এই সমাধানটিতে আস্থা না রেখে আইনস্টাইন তার সূত্রটিতে একটি মহাজাগতিক ধ্রুবক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

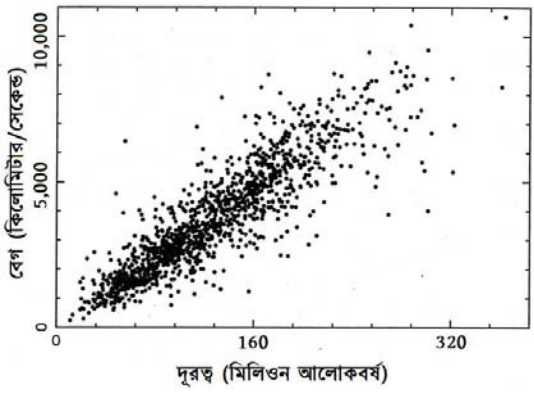

বিজ্ঞানী হাবল দূর দূরান্তের গ্যালাক্সির ডপলার শিফট মেপে দেখালেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্যি সত্যি প্রসারিত হচ্ছে। একটি গ্যালাক্সি যত দূরে সেটি তত বেশি বেগে ছুটে যাচ্ছে। আসলে গ্যালাক্সিটি সরে যাচ্ছে না, সেটি যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটি সরে যাচ্ছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আসলেই প্রসারিত হচ্ছে সেটি বের করেছিলেন হাবল নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলো একটা একটা করে দেখতে লাগলেন। গ্যালাক্সি থেকে যে আলো আসে সেই আলোকে বিশ্লেষণ করে তিনি সেগুলোর গতিবেগ বের করতে লাগলেন।

আমাদের সাপেক্ষে গ্যালাক্সিগুলোর যদি গতি থাকে তাহলে সেই গ্যালাক্সি থেকে যদি কোনো আলো আমাদের কাছে আসে, আমাদের মনে হবে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের নাম ডপলার শিফট। গ্যালাক্সিটি যদি দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হয়ে যাবে (এটাকে বলে রেড শিফট), যদি কাছে আসতে থাকে তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে যাবে (সেটাকে বলে ব্লু শিফট)। দৃশ্যমান আলোতে লাল আলোর

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লম্বা, নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট, তাই এরকম নামকরণ। নির্দিষ্ট পরমাণু থেকে বের হওয়া তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কত হবে সেটি জানা থাকে তাই সেটি প্রসারিত হয়েছে নাকী সংকুচিত হয়েছে সেটি বলা যায়। কাজেই গ্যালাক্সিটি কোন দিকে কত বেগে ছুটে যাচ্ছে সেটাও বের করা যায়।

হাবল দেখলেন একটি গ্যালাক্সি যত দূরে সেটি তত বেশি বেগে ছুটে সরে যাচ্ছে। যদি দেখা যায় সবগুলো গ্যালাক্সি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার অর্থ একসময় সবগুলো গ্যালাক্সি নিশ্চয়ই এক জায়গায় ছিল! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে শুরু করায় একটি গ্যালাক্সি অন্য গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে।

'সবচেয়ে বড় ভুল'

আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির সমাধানটি সঠিকভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। তিনি সেটা মেনে নেননি, শুধু শুধু জোর করে একটি মহাজাগতিক ধ্রুব বসিয়ে সমীকরণটিকে পরিবর্তন করেছিলেন। হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের সেই বিস্ময়কর তথ্যটি জানার পর আইনস্টাইন তার এই মহাজাগতিক ধ্রুবটিকে নিয়ে বলেছিলেন, 'এটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।'

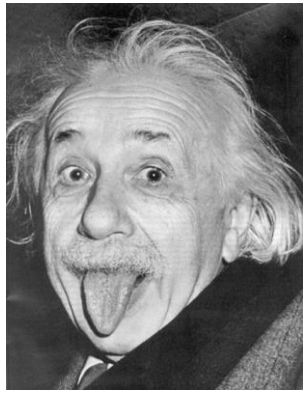

আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির দেয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের সমাধানটি সঠিকই ছিল, মহাজাগতিক ধ্রুবক ঢুকিয়ে সেটি সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না। আইনস্টাইন বলেছিলেন, "এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল!"

বিগ ব্যাং

যাই হোক হাবলের এই যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়ই একটি প্রসারণ দিয়ে শুরু হয়েছে—তারা হিসেব করে বের করলেন এই প্রসারণটি শুরু হয়েছে আজ থেকে 13.8 বিলিওন বছর আগে। বিজ্ঞানীরা সস্নেহে যার নাম দিয়েছেন বিগ ব্যাং!



বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্যালাক্সি যদি একে অন্যের থেকে ছুটে যেতে থাকে তাহলে অতীতের কোনো এক সময়ে নিশ্চয়ই সবকিছু এক বিন্দুতে ছিল! হিসেব করে দেখানো যায় 13.8 বিলিওন বছর আগে একটা "বিস্ফোরণে" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়, সেটিই হচ্ছে বিগ ব্যাং। (বিস্ফোরণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত প্রসারণ বোঝানোর জন্যে, এটি আসলে প্রচলিত অর্থে বিস্ফোরণ নয়!)

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের চাইতে বিস্ময়কর প্রাণী আর কী হতে পারে? মহাবিশ্বের বিলিওন বিলিওন গ্যালাক্সির সাধারণ একটা গ্যালাক্সির নাম ছায়াপথ, সেই গ্যালাক্সির সাদামাটা একটা নক্ষত্রের নাম সূর্য, সেই সূর্যের ছোট একটি নীল গ্রহের নাম পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বাসিন্দার নাম মানুষ, তাদের মাথার দেড় কেজি ওজনের মস্তিষ্কটি ব্যবহার করে তারা বের করে ফেলেছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে! কেমন করে গ্যালাক্সির জন্ম হয়েছে, কেমন করে নক্ষত্র আমাদের রাতের আকাশ আলোকিত করেছে। কী আশ্চর্য!

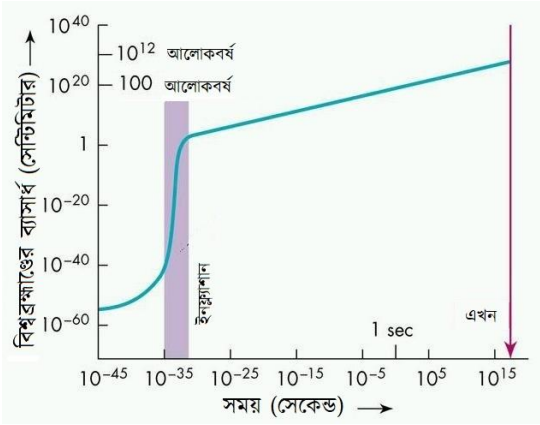

বিগ ব্যাংয়ের পর পর একটি অচিন্ত্যনীয় অস্বাভাবিক বিস্ময়কর প্রসারণ হয়েছিল যেটাকে বলা হয় ইনফ্লাশন, এক সেকেন্ডের বিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন ভাগের এক ভাগ সময়ে (10^{-30} সেকেন্ড) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন (10^{60}) গুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেই প্রসারিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র একটা অংশ (যার আকার একটা কমলার মতো!) পরবর্তিতে ধীরগতিতে প্রসারিত হয়ে আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়েছে।

ইনফ্লাশান

আজ থেকে 13.8 বিলিওন বছর আগে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠিক জন্মের মুহূর্তটি কিংবা ঠিক তার পরের মুহূর্তগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো কিছু বলতে পারেন না, 10^{-41} সেকেন্ড পার হওয়ার আগে ব্যবহার করার মত বিজ্ঞান এখনো বের হয়নি। তবে 10^{-41} সেকেন্ড সময়টি এত ক্ষুদ্র একটা সময় যে এটা আসলে অনুভব পর্যন্ত করা যায় না।

যাই হোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জন্ম হবার পর আনুমানিক 10^{-30} সেকেন্ড পর্যন্ত একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে, সেটা হচ্ছে একটি অবিশ্বাস্য প্রসারণ যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ইনফ্ল্যাশান। ইনফ্ল্যাশানের প্রসারণটি ছিল অবিশ্বাস্য থেকেও অবিশ্বাস্য। এই প্রসারণটির গতি ছিল আলোর বেগ থেকেও বেশি। আলোর বেগ মনে



বিগ ব্যাং একটা বিন্দুতে হয়নি এটা একসাথে "সব" বিন্দুতে হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র আমাদের কাছে দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা জানি, অন্য বিন্দু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য অংশ তৈরি হয়েছে যার কথা আমরা জানি না, জানব না!

আছে তো? সেকেন্ডে তিনশ হাজার কিলোমিটার। (লক্ষ কর আমি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল না বলে তিনশ হাজার কিলোমিটার বলেছি! শুধু তাই না, সহজ করে তিন লক্ষ কিলোমিটারও বলিনি। মাইল, লক্ষ কোটি এই কথাগুলো ব্যবহার না করার চেষ্টা করেছি।) তোমরা যারা জান যেকোনো বস্তু আলোর বেগ থেকে দ্রুত যেতে পারে না তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই প্রসারণ আমাদের পরিচিত থিওরি অফ রিলেটিভিটিকে অস্বীকার করে না। এখানে কোনো বস্তু বা কোনো তথ্য আলোর চাইতে

দ্রুতগতিতে যাচ্ছে না। জায়গা বা Space এর প্রসারণ হচ্ছে আলো থেকে দ্রুত, এটি হতে পারে।

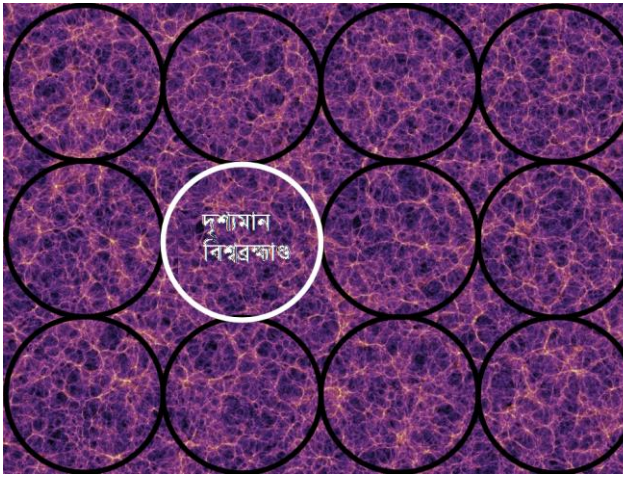

আমরা আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি দেখতে পাই। আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশে পাশের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলো দেখতে পাই না।

যাই হোক, এই অবিশ্বাস্য থেকেও অবিশ্বাস্য প্রসারণে—অর্থাৎ 10^{-30} সেকেন্ড বা এক সেকেন্ডের বিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন ভাগের এক ভাগ সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকার 10^{60} বা ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন গুণ বেড়ে গেল। এই অচিন্ত্যনীয়, অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় প্রসারণের পর আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকার কতটুকু হলো কল্পনা করতে পারবে? তার আকার হলো একটা কমলার মতো! না আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না—অচিন্ত্যনীয় প্রসারণের পরও কোনো কিছুর আকার একটা কমলার মতো হওয়ার অর্থ, শুরুতে এটা ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র তার থেকেও ক্ষুদ্র ছিল!

এরপর আনুমানিক 13.8 বিলিওন বছর কেটে গেল। ইনফ্ল্যাশানের অবিশ্বাস্য প্রসারণটি কমে গিয়ে স্বাভাবিক গতিতে প্রসারণ হয়েছে। সেই প্রসারণের কারণে আমাদের ছোট কমলার মতো সাইজের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটির আকার এখন একশ বিলিওন আলোকবর্ষের মতন। (এক বছরে আলো যেটুকু দূরত্ব যায় সেটা হচ্ছে এক আলোকবর্ষ, মিটার কিলোমিটারে দূরত্ব না মেপে আলোক বর্ষে দূরত্ব মাপার একটি কারণ আছে, একটু পরেই তোমাদের সেটি বলব!)

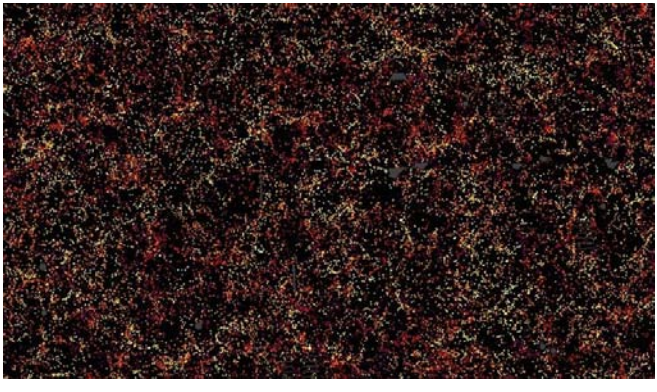

কপিউটার সিমুলেশনে ব্যবহৃত মহাকাশের এক কোণার অসংখ্য গ্যালাক্সি। এখানে প্রত্যেকটি বিন্দু একটি করে গ্যালাক্সি!

দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

তোমরা কী একটা বিষয় লক্ষ করেছ, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কথাটি লেখার সময় বলছি, 'আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'? তার মানে কী 'আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' ছাড়াও অন্যদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে?



আলোর একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে, আলো এর চাইতে দ্রুত যেতে পারে না।

ব্যাপারটা আসলে অনেকটা সেরকম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুধুমাত্র খানিকটা আমরা দেখতে পাই, যেটাকে বলা হয় দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—তার বাইরের অংশটুকু দেখতে পাই না, কখনোই দেখতে পাব না। 13.8 বিলিওন বছর আগে সম্ভবত অসীম একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতর থেকে কমলার মতো একটা অংশ বিস্তৃত হয়ে আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়েছে! তার বাইরের অংশটুকু বিস্তৃত হয়ে আরো বড় একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, কিছু জানতেও পারব না।

কেন কিছুই জানতে পারব না? তার কারণ আলোর বেগের একটা সীমা আছে, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডে তিনশ হাজার কিলোমিটার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি প্রসারিত না হতো, তাহলে আগে হোক পরে হোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো প্রান্ত থেকে আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতো। কিন্তু যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে তাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে থাকলে সেখানকার আলো আর আমাদের কাছে কখনো পৌঁছাতে পারবে না—সেটা আমাদের ধরা ছোঁয়া জানার

বাইরে থেকে যাবে। তোমরা ইচ্ছা করলে এরকম একটা অবস্থা চিন্তা করতে পার: মনে কর আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্তের কোনো একটা গ্যালাক্সি থেকে আলো এসে আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে–তাই আমরা গ্যালাক্সিটাকে দেখতে পারছি। এবারে মাঝখানের স্থানটুকু ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যখন আলো আর পৌঁছাতে পারছে না, পৃথিবী থেকে আমরা দেখব একটা গ্যালাক্সি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিরদিনের জন্যে!



আমরা যখন সূর্যকে দেখি সেটি এই মুহূর্তের সূর্য নয়, সেটি আট মিনিট আগের সূর্য!

অতীতের ছবি

যাই হোক এবারে অন্য একটা বিষয় একটু আলোচনা করে নেয়া যাক। একটু আগেই তোমাদের বলা হয়েছে যে আলোকবর্ষ দিয়ে দূরত্ব মাপা হয়। আলোর একটা নির্দিষ্ট বেগ রয়েছে তাই দূরত্ব অতিক্রম করতে সেটা সময় নেয়। তাই আমরা যখন সূর্যের দিকে তাকাই আমরা কিন্তু এই মুহূর্তের সূর্যকে দেখি না, আট মিনিট

আগের সূর্যকে দেখি, কারণ সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে আট মিনিট সময় লাগে। কোনো একটা বিচিত্র কারণে হঠাৎ করে যদি সূর্যটা অদৃশ্য হয়ে যায় আমরা কিন্তু সেটা জানতে পারব আট মিনিট পরে। ঠিক সেরকম আমরা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা নক্ষত্রকে মিট মিট করে জ্বলতে দেখি সেটি কিন্তু এই মুহূর্তের নক্ষত্র নয়। সেটা কত দূরে আছে তার উপর নির্ভর করবে কত মিলিওন কিংবা কত বিলিওন বছর আগের নক্ষত্রটিকে দেখছি! যেমন আমাদের সবচেয়ে কাছের এনড্রোমিডা গ্যালাক্সিটি যখন আমরা দেখি তখন কিন্তু আমরা এই মুহূর্তের এনড্রোমিডা দেখছি না। 2.5 মিলিওন বছর আগে এনড্রোমিডা কেমন ছিল সেটা দেখছি

কাজেই পরের বার যখন আকাশের দিকে তাকাবে তখন একবার মনে কর তুমি কিন্তু মিলিওন কিংবা বিলিওন বছর অতীতে তাকিয়ে আছ।

চার শক্তির আত্মপ্রকাশ

এবারে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। 13.8 বিলিওন বছর আগের কোনো একটা সময় 'বিগ ব্যাং' দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি শুরু কিংবা প্রথম কয়েক মুহূর্ত সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তোমাদের আগেই বলা হয়েছে 10^{-30} সেকেন্ড সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিন্দু অচিন্ত্যনীয় দ্রুততায় 10^{60} গুণ প্রসারিত হয়েছে। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে কৌতূহলী হয়ে লাভ নেই—সেখানে কী হয়েছে আমরা কখনো জানব না! আমরা ইনফ্ল্যাশানের পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছোট একটা কমলার মতো আকারের অংশটুকু নিয়ে মাথা ঘামাব, কারণ পরবর্তী 13.8 বিলিওন বছরে সেটাই বিস্তৃত হয়ে প্রায় একশ বিলিওন আলোকবর্ষ বিস্তৃত হবে যেটাকে আমরা বলব আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

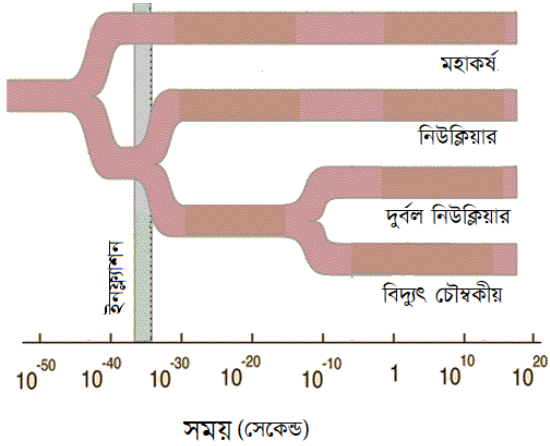

বিগ ব্যাংয়ের সময় প্রকৃতির চারটি শক্তিকে আলাদা করা যেতো না। বিগ ব্যাংয়ের পর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেগুলো আলাদা হয়েছিল। সময়ের স্কেলটি কিন্তু ছিল খুবই ক্ষুদ্র।

ইনফ্ল্যাশানের অবিশ্বাস্য প্রসারণ শেষে যখন স্বাভাবিক প্রসারণ শুরু হয়েছে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা 10^{32} ডিগ্রি সেলসিয়াস। তোমরা অনেকেই হয়তো জান, প্রকৃতিতে চার ধরনের শক্তি রয়েছে: মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়, দুর্বল নিউক্লিয়ার এবং নিউক্লিয়ার। মহাকর্ষ বল সবাই জান যে বলটির কারণে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘোরে। বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি আমরা সবচেয়ে বেশি জানি, আলো এবং বিদ্যুৎ হচ্ছে এর বড় উদাহরণ। পরমাণুতে ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসও বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তিতে আটকে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার সবচেয়ে কম, সে কারণে দৈনন্দিন জীবনে এর দেখা পাই না। নিউক্লিয়ার শক্তি আমরা দেখতে পাই, কারণ সূর্য থেকে যে আলো বের হয় সেটি সৃষ্টি হয় একধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দিয়ে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসের

প্রোটন এবং নিউট্রন এই শক্তি দিয়ে নিউক্লিয়াসে আটকা পড়ে আছে।

তোমাদেরকে যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়া হলো তাদের রূপ একেবারেই ভিন্ন। বিগ ব্যাং দিয়ে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাত্রা শুরু করেছে তখন কিন্তু এই চারটি শক্তি আলাদা করা যেত না। যতই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে শুরু করল, তার তাপমাত্রা কমতে লাগল তখন একটি একটি করে শক্তি আলাদা আলাদাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

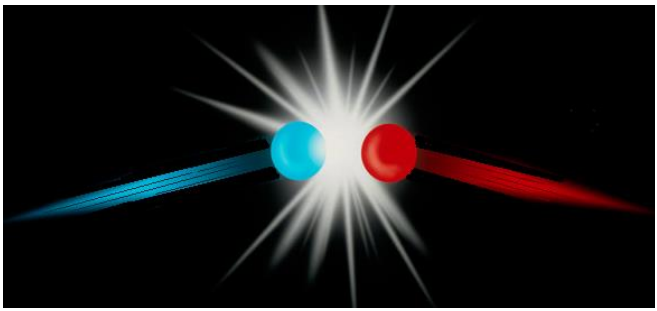

প্রতিপদার্থ যখন পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন দুটিই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

পদার্থ প্রতিপদার্থ

সময়ের সাথে সাথে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কণার জন্ম হয়েছে সেটি আমরা পরের ছবিতে দেখিয়েছি। তোমাদের যাদের কৌতূহল বেশি তারা সেখানে এটি দেখে নিতে পার। এখানে আমরা এত খুঁটিনাটিতে না গিয়ে সহজ ভাষায় জরুরি কথাগুলো বলে দিই।

বিগ ব্যাং শুরু হওয়ার এক সেকেন্ড পর নিউট্রন প্রোটন জাতীয় কণাগুলো তৈরি হয়ে গেল। শক্তি থেকে যখন কণা তৈরি হয় তখন

সমান সমান পদার্থ এবং প্রতিপদার্থ তৈরি হয়। তোমরা নিশ্চয়ই প্রতিপদার্থের নাম শুনেছ। এই অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রতিপদার্থ যখন পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন দুটিই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজেই বিগ ব্যাং শুরু হওয়ার এক সেকেন্ড পর যে নিউট্রন প্রোটন এবং তাদের প্রতিপদার্থ (এন্টি প্রোটন এবং এন্টি নিউট্রন) তৈরি হয়েছিল, তাদের একটি আরেকটির সাথে একত্রিত হয়ে শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি কণাও বেঁচে থাকার কথা ছিল না–কিন্তু প্রকৃতির কোনো এক রহস্যের কারণে প্রতিপদার্থ থেকে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ পদার্থ বেশি তৈরি হয়েছিল (এক বিলিওন কণার ভেতর একটি!)। সে কারণে দেখা গেল কিছু নিউট্রন প্রোটন বেঁচে গিয়েছে। যদি তা না হতো তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি করার জন্য একটাও প্রোটন নিউটন থাকত না, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো পরিচিত বস্তু থাকত না, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকত শুধু শক্তি!

এক সেকেন্ড থেকে প্রথম তিন মিনিটের ভেতর ইলেকট্রনের মতো কণাগুলো তৈরি হয়ে গেল। এখানেও সেই একই রহস্যময় ব্যাপার, সমান সমান পদার্থ প্রতিপদার্থ তৈরি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রকৃতির কোনো এক রহস্যের কারণে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ ইলেকট্রন বেশি তৈরি হয়েছিল। সে কারণে সব পদার্থ প্রতিপদার্থ একে অন্যকে ধ্বংস করে শক্তিতে পরিণত হওয়ার পরও কিছু বেঁচে যাওয়া সৌভাগ্যবান ইলেকট্রন, কিছু বেঁচে যাওয়া সৌভাগ্যবান প্রোটন আর নিউট্রনের সাথে মিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাণুগুলো তৈরি করেছিল। তা না হলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কী যে হতো কে জানে!

এর পরের বিশ মিনিটের ভেতর নিউট্রন আর প্রোটন মিলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হতে শুরু করল। তাপমাত্রা কমে তখন বিলিওন ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

তোমরা লক্ষ করেছ আমরা এতক্ষণ সেকেন্ড এবং মিনিট নিয়ে কথা বলেছি! বিগ ব্যাং এর মাত্র বিশ মিনিটের মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করার জন্যে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন আর প্রোটন (এবং কিছু সহজ নিউক্লিয়াস) তৈরি হয়ে গেছে! কিন্তু তবু পরমাণু তৈরি হতে পারছিল না, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তিশালী ফোটন সেগুলোকে আঘাত করে খণ্ড বিখণ্ড করে দিচ্ছিল!

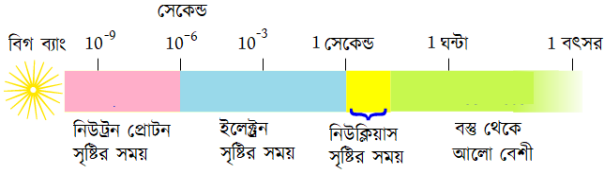

বিগ ব্যাং এর পর কখন কী তৈরি হয়েছে।

মুক্ত আলো

কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অপেক্ষা করতে হলো। একদিন দুদিন নয়, এক বছর দুই বছরও নয়, 380,000 বছর পর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি ফুলে ফেঁপে বড় হয়েছে এবং তাপমাত্রা কমে এসেছে তখন ইলেকট্রন এবং প্রোটন মিলে হাইড্রোজেন পরমাণু (এবং অল্প কিছু) হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হতে শুরু করল। তখন একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটল।

ইলেকট্রন এবং প্রোটনের চার্জ আছে, কাজেই আলো এদের সাথে বিক্রিয়া করে এবং বলা যেতে পারে এদের মাঝে আটকা পড়ে থাকে। বিগ ব্যাংয়ের 380,000 বছর পর যখন হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি হতে শুরু করল, সেইগুলো কিন্তু ছিল চার্জবিহীন। তাই হঠাৎ

করে ফোটন বা আলো মুক্ত হয়ে গেল! এবং প্রথমবার সেগুলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

তারপর প্রায় 13.8 বিলিওন বছর কেটে গেছে, বিগ ব্যাং এর 380,000 বছর পরের সেই মুক্ত হয়ে যাওয়া আলো আমরা কিন্তু এখনো দেখতে পাই। এই সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি প্রসারিত হয়েছে, কাজেই আলোটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও প্রসারিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বের করেছেন এখন এই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে এখন আর সেটি আলো নেই, মাইক্রোওয়েভে রূপ নিয়েছে। পৃথিবীতে সত্যি সত্যি সেই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ পাওয়া গেছে—এটা হচ্ছে বিগ ব্যাংয়ের একটা বড় প্রমাণ!

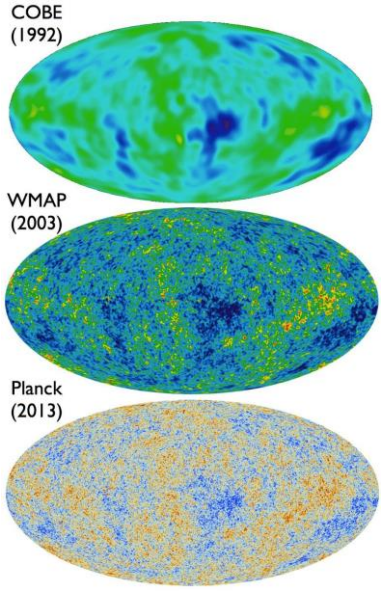

বিগ ব্যাংয়ের 380,000 বছর পর যখন পরমাণু তৈরি হলো তখন প্রথমবার আলো বা ফোটন মুক্ত হতে পারল। 13.8 বিলিওন বছরে 92.8 বিলিওন আলোকবর্ষ বিস্তৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেদিকেই তাকেই সেদিকেই আমরা সেই আলো দেখতে পাই। তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের জন্যে সেই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়েছে, তাই সেটাকে বলি কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB)। এই CMB অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে এটি 1992 সালে, 2003 সালে এবং 2013 সালে আরো একবার আরো নিঁখুতভাবে মাপার চেষ্টা করা হয়েছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে উড্রো উইলসন এবং আর্নো পেনজিয়াস নামে বেল ল্যাবের যে দুইজন বিজ্ঞানী এটি বের করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তারা কিন্তু মোটেও সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন না। তাদের এন্টেনাতে এই সিগন্যালটি ছিল একটি যন্ত্রণা—তারা উল্টো এটা দূর করার চেষ্টা করছিলেন! কিছুতেই যখন দূর করতে পারছেন না—তখন হঠাৎ করে জানতে পারলেন যে এটি দূর হবে না, বিগ ব্যাং হওয়ার 380,000 বছর পর এটি মুক্ত হয়েছে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিন্দুতে এটি আছে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পাগলের মত এটা খুঁজে বেড়াচ্ছে!

যাই হোক, এই সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদিও পরমাণু তৈরি হয়ে গেছে—শতকরা 75 ভাগ হাইড্রোজেন, 25 ভাগ হিলিয়াম, কিন্তু পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার কারণ তখন পর্যন্ত কোনো নক্ষত্রের জন্ম হয়নি, কোনো নক্ষত্র "জ্বলে" উঠেনি।

তারপর আরো সুদীর্ঘ 150 মিলিওন বছর কেটে গেছে এবং তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি দুটি করে নক্ষত্র জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

ডার্ক ম্যাটার

এই বেলা তোমাদের আরেকটা খুবই বিস্ময়কর তথ্য দেওয়া যায়! বিগ ব্যাংয়ের 380,000 বছর পর যে আলো মুক্ত হয়ে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল, 13.8 বিলিওন বছর পর আমরা এখন সেই আলোটি খুব নিখুঁতভাবে মাপতে পারি। সেই অতি নিখুঁত পরিমাপ থেকে একটি অবিশ্বাস্য বিষয় বের হয়ে এসেছে। সেটি হচ্ছে বিগ ব্যাংয়ের ফলে যে পরিচিত নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন তৈরি হয়েছে এবং সেই ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন দিয়ে আমাদের পরিচিত 'বস্তু' তৈরি হয়েছে তার বাইরেও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের 'বস্তু' তৈরি হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। হ্যাঁ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, আমরা এর সম্পর্কে কিছু জানি না। এর নাম দেওয়া হয়েছে ডার্ক

ম্যাটার (অন্ধকার বস্তু?), এটি দেখা যায় না, এটি কোনো রকম বিক্রিয়াও করে না, কিন্তু এটা যে আছে সেটা বোঝা যায় তার মহাকর্ষ বল থেকে। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যদিও এটি দেখা যায় না কিন্তু তার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে! উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, গ্যালাক্সিগুলো যে নিজের অক্ষে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা পর্যন্ত আমরা ডার্ক ম্যাটার ছাড়া ব্যাখ্যা করতে পারি না। তোমরা শুনে অবাক হয়ে যাবে, বিগ ব্যাংয়ের 380,000 বছর পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোট ভরের 63% ছিল এই ডার্ক ম্যাটার!

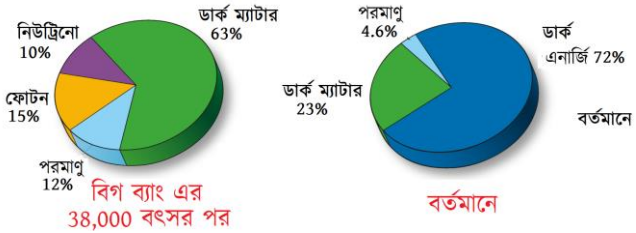

CMB এর তথ্যটি বিগ ব্যাংয়ের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ, একই সাথে এটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ একটি নতুন তথ্য দিয়েছে! সেটি হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত "বস্তু" আছে তার থেকে অনেক বেশি আছে ডার্ক ম্যাটার, আমরা সেটাকে দেখি না কিন্তু তার মহাকর্ষ বল থেকে সেটা অনুভব করতে পারি। বিগ ব্যাংয়ের 38,000 হাজার বছর পর 63% ডার্ক ম্যাটার ছিল, এখন সেটি 23%। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারণের কারণে নতুন একটি বিষয় যোগ হয়েছে। সেটি হচ্ছে ডার্ক এনার্জি। এটি জায়গা বা space এ থাকে, কাজেই space বাড়লে ডার্ক এনার্জিও বাড়তে থাকে। বিজ্ঞানীরা ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানলেও সেগুলো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। সে জন্যে বলা হয় আমরা বর্তমানে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাত্র 4.6% সম্পর্কে জানি!

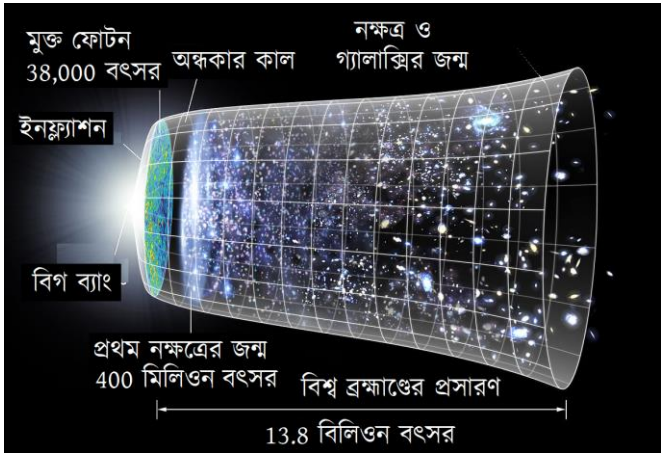

বিগ ব্যাংয়ের পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ছবি। মনে রেখো—এটি আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! এটি লগ স্কেলে আঁকা, যার অর্থ এটি সরল রৈখিক না—পরের ঘর আগের ঘর থেকে অনেকগুণ বড়!

নক্ষত্রের জন্ম

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই ডার্ক ম্যাটার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ডার্ক ম্যাটারের যেহেতু মহাকর্ষ বল রয়েছে, সেটি হাইড্রোজেন (এবং হিলিয়াম) এর অণু-পরমাণুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে জায়গায় জায়গায় হাইড্রোজেন গ্যাস জমা হতে থাকে। মহাকর্ষ বল আবার সেগুলোকে আকর্ষণ করে কেন্দ্রীভূত করতে থাকে। চাপের কারণে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাপমাত্রা যখন যথেষ্ট বেড়ে যায় তখন হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস (বা প্রোটন) এর একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে নিউক্লিয়ার ফিউসান শুরু হয়ে যায়। সেই ফিউসানের কারণে গ্যাসের এই গোলকের মাঝে প্রচণ্ড শক্তি

সৃষ্টি হয় এবং পুরো গ্যাসের গোলকটি আলোকিত হয়ে যায়। আমরা বলি একটি নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে।

এভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি একটি করে নক্ষত্র জন্মাতে থাকে। আবার বিলিওন বিলিওন নক্ষত্র নিয়ে তৈরি হয় একটি গ্যালাক্সি। অনুমান করা হয় আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রায় ট্রিলিওন গ্যালাক্সি আছে।



5 বিলিওন বছর আগে মিল্কিওয়ে (ছায়াপথ) গ্যালাক্সিতে মহাজাগতিক ধুলাবালি আর গ্যাস থেকে জন্ম নিল একটি নেবুলা। সেটি দেখতে ছিল অনেকটা এরকম।

সৌর জগত

এই ট্রিলিওন গ্যালাক্সির একটির নাম হচ্ছে ছায়াপথ। যেটি আমাদের গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সির একটি নক্ষত্রের নাম হচ্ছে সূর্য।

ছায়াপথ নামের এই গ্যালাক্সির এক প্রান্তে বেশ খানিকটা গ্যাস, ধূলিকণা, হাইড্রোজেন ইত্যাদি জমা হয়েছিল, এস্ট্রোনমির ভাষায় এটাকে বলে নেবুলা। 4.6 বিলিওন বছর আগে এই নেবুলার

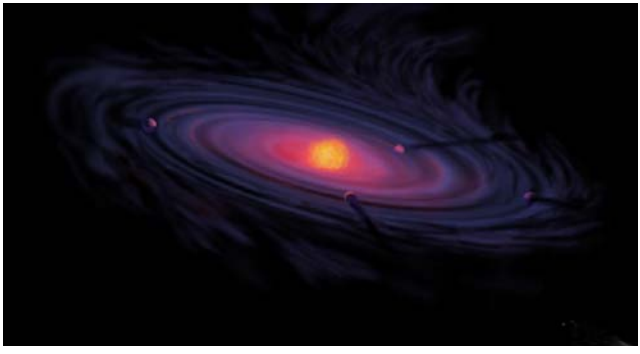

কাছাকাছি একটি সুপারনোভার বিস্ফোরণের ঝাঁকুনিতে ঘুরতে শুরু করল নেবুলাটি। নেবুলার ভরের 99.9% কেন্দ্রে জমা হলো। মহাকর্ষের আকর্ষণে প্রচণ্ড চাপে বেড়ে শুরু হলো নিউক্লিয়ার ফিউসান, জ্বলে উঠল সূর্য! নেবুলার ভরের বাকি 0.1% সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে জমাটবেঁধে তৈরি হতে লাগল গ্রহ।

কাছাকাছি একটা বিশাল নক্ষত্রের বিস্ফোরণের আঘাতে নেবুলাটি একটা বড় ঝাঁকুনি খেলো—গ্যাস ধুলাবালিগুলো তখন ঘুরপাক খেতে খেতে কেন্দ্রে জমা হতে শুরু করল। যতই জমা হতে থাকল ততই তার আকর্ষণ বাড়তে থাকলে এবং নেবুলার ধুলোবালি গ্যাসকে আরো বেশী আকর্ষণ করতে লাগল। যতই বেশি গ্যাস আর ধুলিকণা জমা হতে থাকল ততই মহাকর্ষ বলের জন্যে সেটা কেন্দ্রে আরো বেশী কেন্দ্রীভূত হতে থাকল। ধীরে ধীরে নেবুলার 99.9 শতাংশ পদার্থ জমা হলো কেন্দ্রে এবং প্রচণ্ড চাপে তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকল। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একসময় সেটি এত বেড়ে গেল যে ভেতরে নিউক্লিয়ার ফিউসান শুরু হয়ে গেল—জ্বলে উঠল সূর্য। আলোকিত হয়ে উঠল চারিদিক।

নেবুলার 99.9 ভাগ কেন্দ্রে জমা হয়ে সূর্যে পরিণত হয়েছে। নেবুলার বাকি 0.1 শতাংশ সেই সূর্যকে ঘিরে ঘুরেছে। সেগুলো ঘুরতে



4.5 বিলিওন বছর আগে জন্ম নিল আমাদের পৃথিবী। উত্তপ্ত এবং অস্থিতিশীল।

ঘুরতে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। কক্ষপথের যতকিছু আছে সেগুলো আকর্ষণ করে করে জমাট বাঁধা অংশগুলো আরো বড় হতে শুরু করেছে। এভাবে ধীরে ধীরে জন্ম নিতে শুরু করল গ্রহগুলো। সাড়ে চার বিলিওন বছর আগে জন্ম নেয়া সেই গ্রহগুলোর একটি হচ্ছে পৃথিবী। এর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে 'থিয়া' নামে বিশাল একটি গ্রহাংশের সাথে পৃথিবীর মহাজাগতিক সংঘর্ষে জন্ম হলো চাঁদের। উত্তপ্ত পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হলো। বৃষ্টি হলো পৃথিবীতে, পানিতে ভরে গেল পৃথিবী।

চলমান মহাদেশ



'থিয়া' নামের বিশাল এক গ্রহাংশের সাথে মহাজাগতিক সংঘর্ষে জন্ম নিল চাঁদ।

আগের পৃথিবী কিন্তু দেখতে মোটেও বর্তমান পৃথিবীর মত ছিল না। দুইশত মিলিওন বছর আগেও সবগুলো মহাদেশ একসাথে লেগে ছিল। ধীরে ধীরে সেগুলো একটি অন্যটি থেকে সরে গিয়েছে, কোনো কোনোটি আবার এসে যুক্ত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী দক্ষিণ

আমেরিকা আর আফ্রিকার দিকে তাকালেই কিন্তু বোঝা যায় একসময় নিশ্চয়ই এই দুটি নিশ্চয়ই এক সাথে লাগানো ছিল, এখন সরে গিয়েছে। আবার ভারতবর্ষের অংশটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে উঠে এসে এশিয়ার সাথে ধাক্কা লেগে এশিয়ার ভূমিকে যেভাবে চাপ দিয়েছিল, সেই চাপে বিশাল হিমালয় পর্বতমালার জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর ভূমি কিন্তু এখনো থেমে নেই, সেগুলো এখনো নড়ছে। তাই চলমান সেই ভূমিখণ্ডগুলোর প্রান্তগুলোতে ভূমিকম্প হয় সবচেয়ে বেশি।

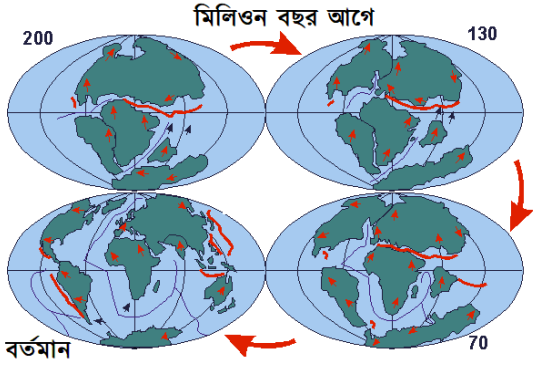

পৃথিবীর মহাদেশগুলো এক সময় লাগানো ছিল, ধীরে ধীরে একে অন্যের থেকে সরে গেছে

জীবন্ত পৃথিবী

সৌর জগতের তৃতীয় এই নীলাভ গ্রহটি অন্য সব গ্রহ থেকে আলাদা, সব থেকে রহস্যময়, সব থেকে বৈচিত্র্যময়। তার কারণ শুধু এই গ্রহটিতে চার বিলিওন বছর আগে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল। কেমন করে শুধু এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হলো?

মিলার এবং উরির এক্সপেরিমেন্ট

1952 সালে স্ট্যানলি মিলার এবং হ্যারল্ড উরি মিলে একটি যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। তারা ল্যাবরেটরিতে খুব সহজ একটি পৃথিবী তৈরি করলেন। কাচের আবদ্ধ একটি গোলকে পানি, মিথেন, এমোনিয়া এবং হাইড্রোজেন আবদ্ধ করে সেখানে তাপ দিয়ে পানিকে বাষ্পীভূত করে আবার সেটাকে শীতল করে তরল করতে থাকলেন, পৃথিবীতে যেরকম সমুদ্র থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে বজ্রপাত হয়, সেটি সৃষ্টি করলেন বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ দিয়ে।



4 বিলিওন বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয়েছিল। 1952 সালে মিলার-উরি একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা করে দেখালেন, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশেই জীবন্ত প্রাণী তৈরির জৈব উপাদান তৈরি হতে পারে।

কিছুদিনের ভেতর তারা দেখলেন এই ফ্লাক্সের ভেতর জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডগুলোর বড় একটি অংশ তৈরি হয়ে গেছে! অর্থাৎ পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল এবং যে অজৈব গ্যাস ছিল সেগুলো দিয়েই পৃথিবীতে জৈব মৌল তৈরি হতে পারে—এবং দীর্ঘ সময়ে সেগুলো ক্রিয়া বিক্রিয়া করে এই পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব।

ডারউইন এবং বিবর্তন

পৃথিবীতে কীভাবে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে, কীভাবে তার বিকাশ হয়েছে সেগুলো আমরা কীভাবে জানি? তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। প্রাণীদের দেহাবশেষ অনেক সময় ফসিল হয়ে রক্ষা পায়, বিজ্ঞানীরা কার্বন ডেটিং করে সেটা কত পুরানো তা বের করে ফেলেন। তখন সেই ফসিল বিশ্লেষণ করে বের করার চেষ্টা করা হয় ফসিলটি কোন প্রাণীর, সেটি কেমন করে এসেছে ইত্যাদি।

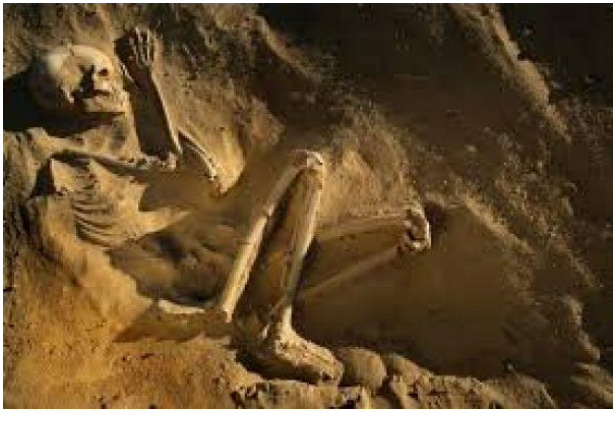

মানুষের ফসিল

জীব বৈচিত্র্য বোঝার জন্যে চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পেরেছি, স্বাভাবিক নিয়মে প্রাণী জগতে পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তিত প্রাণীদের ভেতর যেটা পরিবেশের সাথে নিজেকে বেশি খাপ খাওয়াতে পারে সেটাই শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। আমরা তখন বলি প্রাণীটির বিবর্তন হয়েছে।

প্রথম প্রাণ

মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রায় চার বিলিওন বছর আগে সম্ভবত সমুদ্রের নিচে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আর্বিভাব হয়েছিল। সেই প্রাণ ছিল খুবই সহজ সরল, এক কোষী একটি প্রাণী, যার ভেতরে কোনো নিউক্লিয়াস পর্যন্ত নেই। এই অত্যন্ত আদিম সহজ সরল এক কোষী প্রাণী পৃথিবীতে একদিন দুইদিন নয়, কয়েক বিলিওন বছর টিকে ছিল। অনুমান করা হয় এই সময় পৃথিবীতে ভাইরাসেরও জন্ম হয়ে গেছে।

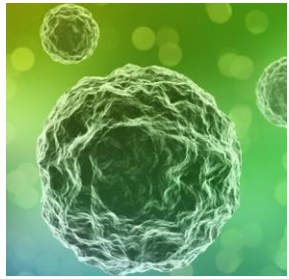

চার বিলিওন বছর আগের আদি প্রাণ ছিল খুবই সহজ সরল নিউক্লিয়াসবিহীন এককোষী প্রাণী! দুই বিলিওন বছর টিকে ছিল এই এক কোষী প্রাণী।

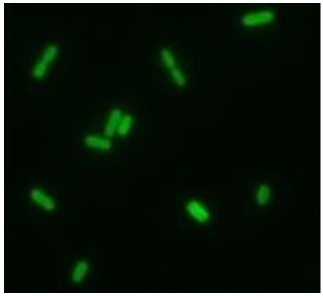

2.4 বিলিওন বছর আগে কিছু এককোষী প্রাণী সালোকসংশ্লেষণ করে তৈরি করতে লাগল অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলে জমা হতে থাকল অক্সিজেন, শ্বসনের প্রয়োজনীয় উপাদান।

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন

প্রায় 2.4 বিলিওন বছর আগে পৃথিবীতে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয় যেগুলো বর্জ্য হিসাবে অক্সিজেন ত্যাগ করতে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এর আগে কোনো অক্সিজেন ছিল না, এই প্রথমবার পৃথিবীতে একটু একটু করে অক্সিজেন জমা হতে থাকে। বর্তমান পৃথিবীর

সকল প্রাণীর নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় যে অক্সিজেন, পৃথিবীতে সেই অক্সিজেন আসার পর নানা ধরনের বিক্রিয়া হয়ে পৃথিবীর পরিবেশের পরিবর্তন হতে শুরু করে।

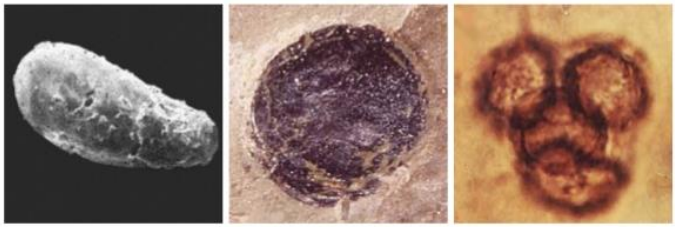

2 বিলিওন বছর আগে তৈরি হলো নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ, উন্মোচন হল জীবন বিকাশের নতুন দিগন্ত। কয়েকটি নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ বা ইউকারিওটিক কোষের ফসিল।

ইউকারিওটিক কোষ

পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোষের ভেতর নিউক্লিয়াস বা ইউকারিওটিক কোষ। অনুমান করা হয় একটি কোষের ভেতর আরেকটি কোষ ঢুকে গিয়ে দুটিই একটি আরেকটিকে সাহায্য করে বাঁচতে থাকে, যেটি পরে নিউক্লিয়াস হিসাবে পরিচিত হয়। ঠিক একইভাবে একটা কোষের ভেতর আরেকটা কোষ ঢুকে সেখানে শক্তি তৈরি করার ছোটখাটো একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করে ফেলে যেটাকে এখন আমরা বলি মাইটোকনড্রিয়া!

বর্জ্য হিসাবে অক্সিজেন ত্যাগ করে সেরকম এক কোষী ব্যাকটেরিয়াকে গ্রহণ করে ইউকারিওটিক কোষগুলো নতুন এক ধরনের কোষে পাল্টে গেল। কোষের ভেতরের ব্যাকটেরিয়াগুলো

ধীরে ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়ে সালোক সংশ্লেষণ শুরু হলো, আমাদের বর্তমান উদ্ভিদে আমরা এখন যেটা দেখতে পাই।

বহুকোষী প্রাণী

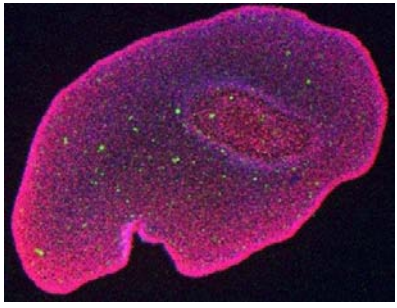

প্রায় নয়শত মিলিওন বছর আগে জন্ম হলো বহুকোষী প্রাণী।

প্রায় আরো এক বিলিওন বছর কেটে গেল। আজ থেকে নয়শত মিলিওন বছর আগে প্রথম বহুকোষী প্রাণের জন্ম হলো। কীভাবে জন্ম কেন জন্ম হলো সেগুলো বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ কথাটি কেউ অস্বীকার করবে না যে এই বহুকোষী প্রাণী দিয়েই পৃথিবীর সত্যিকারের প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হলো। বহুকোষী প্রাণীগুলো পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে নানা ধরনের বিবর্তনের মাঝে দিয়ে যেতে লাগল। এভাবে প্রায় চারশত মিলিওন বছর কেটে গেছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত মিলিওন বছর আগে প্রথম এক ধরনের প্রাণের জন্ম হলো যার শরীরে মেরুদণ্ডের আভাস রয়েছে।

ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ

সাড়ে পাঁচশত মিলিওন বছরের কাছাকাছি সময়টি জীবজগতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়, এই সময়টির নাম ক্যামব্রিয়ান এবং এই সময় একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে



ছয়শ মিলিওন বছর আগে শুরু হয়ে প্রায় একশত মিলিওন বছরব্যাপী ছিল ক্যামব্রিয়ান জৈব জগতের বিস্ফোরণ। বিচিত্র প্রাণীর জন্ম হয় তখন।

ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ। না, এটি সত্যিকারের লণ্ডভণ্ড করা বিস্ফোরণ নয় এটি হচ্ছে প্রাণী জগতের 'বৈচিত্র্যের' বিস্ফোরণ। প্রথম সত্যিকারের মেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্ম হলো এই সময়ে। নানা ধরনের বিচিত্র প্রাণীতে ভরে গেল সমুদ্র।

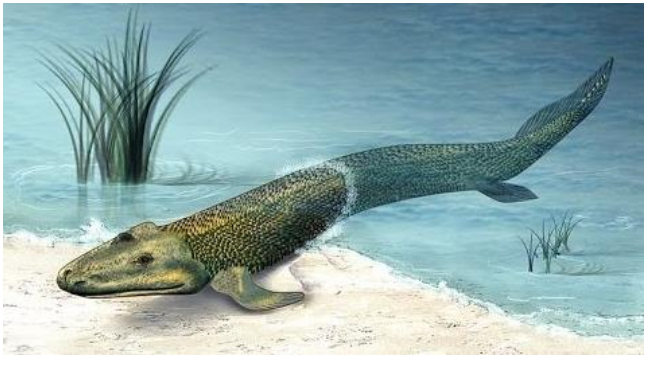

500 মিলিওন বছর আগে প্রাণীদের একটা অংশ ওঠে এলো ডাঙায়।

500 মিলিওন বছর আগে এই প্রাণীদের একটা অংশ প্রথম পানি থেকে ডাঙায় ওঠে এলো। তারপর ধীরে ধীরে গাছপালায় ঢেকে গেল পৃথিবী। পোকা মাকড়ের জন্ম হলো এবং প্রথম চতুষ্পদ প্রাণীর জন্ম হলো।

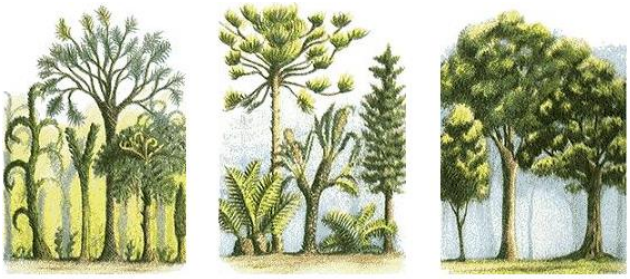

বিচিত্র গাছ পালায় ঢেকে গেল পৃথিবী। জন্ম হলো পোকা মাকড়ের। জন্ম হলো চতুষ্পদ প্রাণীর।

ডাইনোসরের জন্ম মৃত্যু

তিনশ মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসরের জন্ম হলো। ডাইনোসর নামের এই অতিকায় সরীসৃপ সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ালো। অনেক ধরনের ডাইনোসর ছিল, কেউ তৃণভোজী কেউ মাংসাশী। তাদের নানা আকৃতি, নানা আকার। কেউ কেউ আবার আকাশেও উড়তে পারে।



তিনশ মিলিওন বছর আগে জন্ম হলো ডাইনোসরের, তারা প্রবল প্রতাপে দাপিয়ে বেড়ালো পৃথিবীতে।

ডাইনোসরের একটা প্রজাতি প্রায় দুইশত মিলিওন বছর আগে বিবর্তিত হয়ে পাখিতে রূপান্তরিত হয়। ছোট একটা চড়ুই পাখি দেখে কেউ কি অনুমান করতে পারবে যে এর কোনো একটি পূর্বপুরুষ ছিল অতিকায় ডাইনোসর?



দুইশ মিলিওন বছর আগে ডাইনোসরের একটি প্রজাতি থেকে জন্ম হলো পাখির।

প্রায় 65 মিলিওন বছর আগে মহাকাশ থেকে একটা গ্রহাণু এসে পৃথিবীকে আঘাত করল। সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ধুলাবালিতে ঢেকে গেল, পুরো পৃথিবী হয়ে গেল হিম শীতল। এই ভয়ংকর বিপর্যয়ে অতিকায় ডাইনোসর আর টিকে থাকতে পারল না। দেখতে দেখতে তারা পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেল।

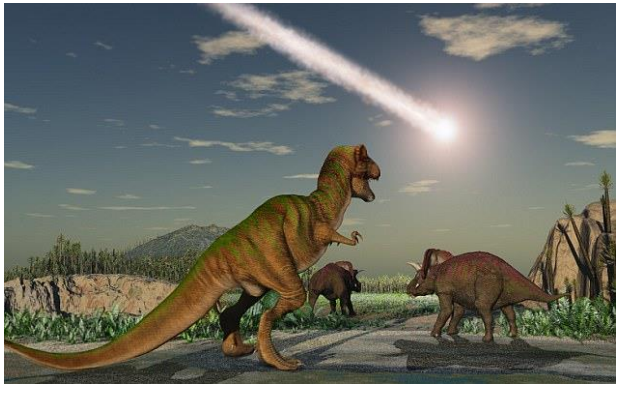

65 মিলিওন বছর আগে একটি গ্রহকণার আঘাতে বদলে গেল পৃথিবীর পরিবেশ। ধ্বংস হয়ে গেল সব ডাইনোসর।

স্তন্যপায়ী প্রাণী

এর মাঝে স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম হয়ে গেছে, তারা খুবই ছোট, আকারে নেংটি ইঁদুরের মতো। যতদিন ডাইনোসর পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে তারা প্রকাশ্যে বাইরে আসতে সাহস পায়নি। ডাইনোসর শেষ হয়ে যাবার পর স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাহস বেড়েছে তারা তখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে পশম থাকে, মা সন্তানকে দুধ খাওয়ায়। তারা উষ্ণ রক্তের প্রাণী, বাইরের তাপমাত্রা যতই থাকুক তারা নিজের শরীরের একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে। এই ছোট ইঁদুরের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ!



স্তন্যপায়ী প্রাণীর রাজত্ব শুরু হলো পৃথিবীতে।

প্রায় পঞ্চাশ মিলিওন বছর আগে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটা অংশ শুকনো থেকে পানিতে নেমে গিয়েছিল, কালক্রমে সেগুলো তিমি এবং ডলফিনে রূপান্তরিত হলো। পানিতে থাকলেও এরা মোটেও মাছ নয়, এরা কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী।

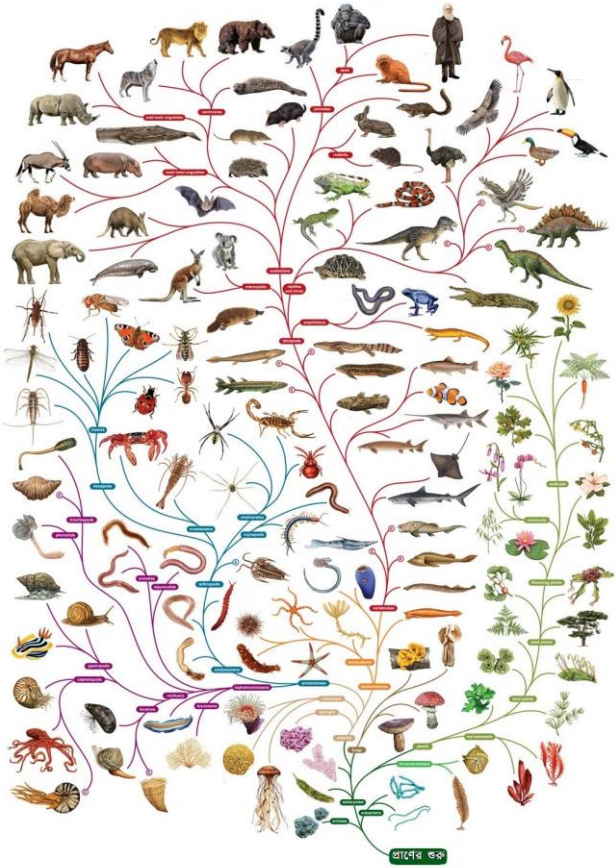

বিবর্তনের কারণে জীব বৈচিত্র্যে ভরে গেছে পৃথিবী।

প্রাইমেট



একটি প্রাইমেটের খুলির ফসিল।

ডাঙায় থাকা নানা ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী বিবর্তনের মাঝে দিয়ে গিয়ে নানা ধরনের রূপ নিয়েছে, এর সব কিছু বলে শেষ করা যাবে না, তাই আমরা শুধু 50-55 মিলিওন বছর আগের বিবর্তিত একটি প্রজাতির কথা বলি, তার নাম হচ্ছে প্রাইমেট। প্রাইমেটের দুটি চোখ সামনে, কালো রং দেখতে পায়, দুই হাতই ব্যবহার করতে পারে। 40 মিলিওন বছর আগে একবার এবং 25 মিলিওন বছর আগে আরেকবার প্রাইমেট দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল, এক ভাগ হচ্ছে বানর, অন্য ভাগ হচ্ছে এপ। বানরের লেজ আছে এপের লেজ নেই।

এখানে অন্য একটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলে নেয়া দরকার। তোমরা নিশ্চয় বিবর্তনের কথা উঠলেই কাউকে না কাউকে বলতে শুনেছ যে এর অর্থ মানুষ বানর থেকে এসেছে। এটি মোটেও সত্যি নয়, ঠিক করে যদি বলতে হয় তাহলে এভাবে বলা যায়, মানুষ এবং বানর দুই প্রজাতিই প্রাইমেট থেকে এসেছে। তার জন্যে সময় লেগেছে প্রায় 25 থেকে 40 মিলিওন বছর!

এপ

এই এপ থেকে বানরের দল বের হওয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গিবন, ওরাংউটান এবং গরিলা আলাদা হয়ে গেল। সবচেয়ে শেষে আলাদা হয়েছে শিম্পাঞ্জি। মাত্র ছয় মিলিওন বছর আগে এপের এই দল থেকে শিম্পাঞ্জি আলাদা হবার পর যারা রয়ে গেছে তারাই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ।

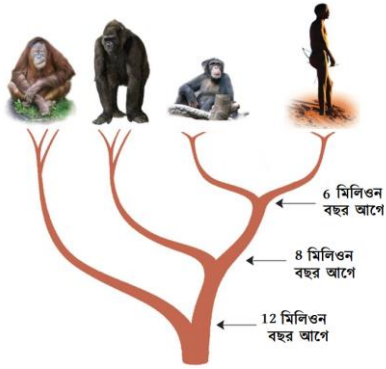

ছয় মিলিওন বছর আগে মানুষ তার নিকটতম প্রজাতি শিম্পাঞ্জি থেকে আলাদা হয়ে গেল।

মানুষ

পৃথিবীর নানা জায়গার নানা ফসিল দেখে প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে তথ্য বের করে বিজ্ঞানীরা আস্তে আস্তে মানব ইতিহাস বের করার চেষ্টা করছেন। এখন পর্যন্ত যেটা বের করেছেন সেটা খুব সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়: সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রাণের বিকাশ হলেও মানুষের বিকাশ হয়েছে আফ্রিকাতে। আজ থেকে ছয় মিলিওন বছর আগে মানুষ যখন প্রথমবার দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল অনেক বড় একটা ঘটনা। কারণ তখন ব্যবহার করার জন্য তাদের দুটি হাত প্রথমবারের মত মুক্ত হয়েছে। সেই হাত দিয়ে তারা অনেক কাজ করতে শুরু করেছে যেটা অন্য

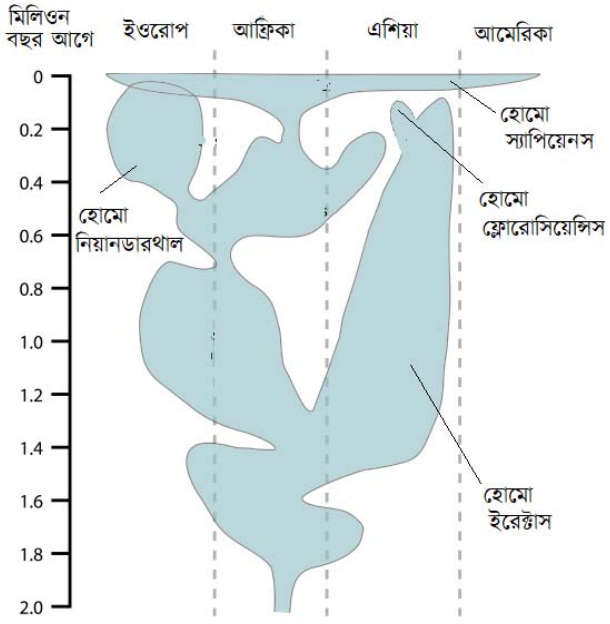

মানুষের নানা প্রজাতি বিকশিত হয়েছে গত দুই মিলিওন বছরে।

কোনোভাবে করা সম্ভব ছিল না। মানুষ তখন পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে, সেই অস্ত্র ব্যবহার করে তারা শিকার করতে শুরু করেছে। তাদের মস্তিষ্কের আকার বড় হলো, বুদ্ধিমত্তা বেড়ে গেল। মস্তিষ্কের সঠিক অংশ বিকশিত হবার পর মানুষ যখন কথা বলে একে অন্যের সাথে ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা অর্জন করল, সেটি ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একটি ঘটনা। অনুমান করা হয় 1 মিলিয়ন থেকে 500 হাজার বছর আগে মানুষ আগুন ব্যবহার করাও শিখে গিয়েছিল।

আদি মানবেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঘুরে বেড়াত। পশুপাখি শিকার করে খেত। একটা জায়গায় খাবার দাবার শেষ হয়ে গেলে দল বেধে অন্য জায়গায় চলে যেত।

পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা ধরনের মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে, সাধারণত যে জায়গায় প্রাচীন মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে সেই জায়গার নাম অনুসারে মানুষটির নাম দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র আমরা আমাদের প্রজাতির নামটি আলাদাভাবে দিয়েছি–হোমো স্যাপিয়েনস বা জ্ঞানী মানুষ। (আমরা যথেষ্ট অহঙ্কারী তাই অন্যদের তাচ্ছিল্য করে নিজেদের জ্ঞানী বলে ঘোষণা করেছি।)

মানুষের অনেকগুলো প্রজাতির জন্ম হয়েছিল শেষ পর্যন্ত যেটি টিকে আছে সেটি হচ্ছে আমাদের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েনস! মানুষের এই অনেকগুলো প্রজাতির ভেতর থেকে এখানে চারটি প্রজাতি সম্পর্কে একটুখানি করে বলা যাক, এই প্রজাতিগুলো হচ্ছে হোমো ইরেক্টাস, হোমো ফ্লোরোসিয়েন্সিস (উচ্চারণ করতে গিয়ে দাঁত ভেঙে যাচ্ছে, কিছু করার নেই।) হোমো নিয়েনডারথাল এবং অবশ্যই হোমো স্যাপিয়েনস।

হোমো ইরেক্টাস

হোমো ইরেক্টাসের কথা আলাদা করে বলতে হবে কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশিদিন টিকে থাকা মানব প্রজাতি। তারা এক দুই হাজার বছর নয়, টানা দুই মিলিওন বছর বেঁচেছিল। আমরা যারা নিজেদের সভ্য মানুষ বলে দাবি করি তাদের বয়স টেনেটুনে একশ হাজার, যেভাবে পৃথিবীটাকে বাসের অযোগ্য

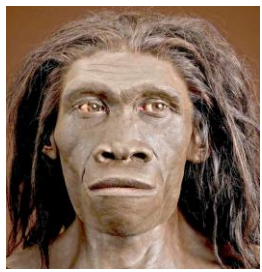

সবচেয়ে দীর্ঘদিন পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা মানুষের প্রজাতি হোমো ইরেক্টাস।

করে তুলেছি একে অন্যের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করছি, যেভাবে পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র তৈরি করছি, আরো এক হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারব কী না সেটা নিয়ে সবাই সন্দেহ করছে!

যাই হোক, হোমো ইরেক্টাস আফ্রিকা থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে একেবারে চীন পর্যন্ত গিয়েছিল। হোমো ইরেক্টাস আনুমানিক 100 হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অনুমান করা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাওয়ার অভাব এই সব কারণে তারা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারেনি।

হোমো ফ্লোরোসিয়েন্সিস

হোমো ইরেক্টাসের একটা অংশ ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরো নামের একটা দ্বীপে দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল, মাত্র বারো হাজার বছর আগে তারা বিলুপ্ত হয়েছে। তাদের নাম হোমো ফ্লোরোসিয়েন্সিস। পানি কম ছিল বলে তারা মূল ভূখণ্ড থেকে ফ্লোরো দ্বীপটিতে হেঁটে হেঁটে চলে গিয়েছিল, পানি বেড়ে যাওয়ায় তারা সেই দ্বীপটিতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। ছোট দ্বীপ, খাবারদাবার বেশি নেই তাই যারা বড়োসড়ো ছিল তারা প্রথমে মারা গেল, টিকে গেল যারা ছোটখাটো, যারা অল্প খেয়েই টিকে থাকতে পারে। তাই সেই দ্বীপের মানুষ ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগল, পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈর্ঘ্য ছিল দুই হাত থেকে একটু বেশি! বলা যায় বড় একটা পুতুলের মতো। এদের আকার

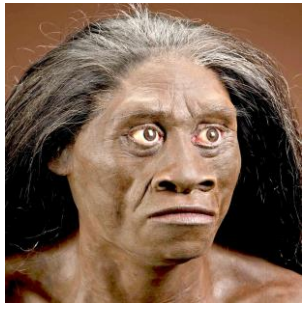

একটি বড়সড় পুতুলের আকারের প্রজাতি হোমো ফ্লোরোসিয়েন্সিস, যারা মাত্র বারো হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে।

পুতুলের মতো হলেও তারা কিন্তু ছিল পুরোপুরি মানুষ! দলবেধে তারা একটা হাতিকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারত!

হোমো নিয়ানডারথাল



হোমোস্যাপিয়েনসের সাথে একই সময় একই জায়গায় ছিল হোমো নিয়ানডারথাল, সম্ভবত তাদের হাতে বিলুপ্ত হয়েছে এই প্রজাতি।

মানবজাতির ইতিহাস বলতে গেলে সব সময় যে প্রজাতির কথা আলাদা করে বলতেই হয় তারা হচ্ছে হোমো নিয়ানডারথাল। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিকে একই সময়ে আলাদা আলাদা জায়গায় কিংবা আলাদা আলাদা সময়ে একই জায়গায় অনেকবারই পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র হোমো নিয়ানডারথাল এবং হোমো স্যাপিয়েনসকে একই সময় একই জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। দুটি প্রজাতিই আফ্রিকা থেকে বের হয়ে ইউরোপ এবং এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন তাদের দেখা হয়েছে তখন তারা কী মিলেমিশে থেকেছে না খুনোখুনি করেছে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কিন্তু অনুমান করা যায় নিশ্চয়ই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে বেশি সক্ষম সে অন্যকে শেষ করে দিয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ এই পৃথিবীতে কতবার কত দেশে গায়ের রং একটুখানি ভিন্ন হলে, ভাষা ভিন্ন হলে, ধর্ম ভিন্ন হলে মানুষ কত নিষ্ঠুরভাবে তাদের সাথে আচরণ করে। মিলিওন বছর পরেও আমরা যদি সভ্য মানুষ হয়েছি দাবি করে একে অন্যের উপর এত অত্যাচার

করতে পারি তাহলে আজ থেকে কয়েক মিলিওন বছর আগে আমরা যে অনেক কম নিষ্ঠুর ছিলাম সেটাতো দাবি করা যাবে না।

নিয়ানডারথালেরা শীতল আবহাওয়ায় থাকার জন্যে বেশি উপযুক্ত ছিল, তাদের মস্তিষ্কের আকার এবং গঠনও হোমো স্যাপিয়েনসদের মতো। তারপরেও দেখা গেল, হোমো স্যাপিয়েনসরা টিকে থাকল কিন্তু নিয়েনডারথালেরা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখনো সঠিকভাবে জানা নেই কেন সেটি ঘটেছে, অনুমান করা হয় আমাদের পূর্ব পুরুষেরা নিয়ানডারথালদের শেষ করে দিয়েছে। হতে পারে সেটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম গণহত্যা বা জেনোসাইড!

হোমো স্যাপিয়েনস

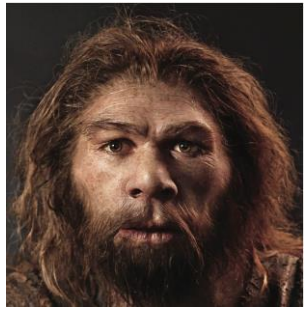

আমাদের পুর্বপুরুষ হোমো স্যাপিয়েনস

এখানে অবশ্যি একটু ভাবনা চিন্তার বিষয় আছে। সেই সময় পৃথিবীতে যে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ ছিল, তারা যদিও তখন দুটি হাত ব্যবহার করে অস্ত্র তৈরি করতে পারত, আগুন ব্যবহার করতে পারত, তবুও কিন্তু প্রথমে তারা একটি বুদ্ধিমান পশু ছাড়া আর কিছু ছিল না।

তখন কোনো এক রহস্যময় কারণে হয়তো একটি হোমো স্যাপিয়েনস পরিবারে একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল যে ছিল অন্যদের থেকে আলাদা! হঠাৎ করে সে আর পশু নয়, সে মানুষ! তার সৌন্দর্যের অনুভূতি আছে, সে বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে, যে জিনিসটি নেই সেটাও কল্পনা করতে পারে। পৃথিবীর সব মানুষ সেই আদি মাতার সন্তান। অনুমান করা হয় সেই আদি মাতার জন্ম

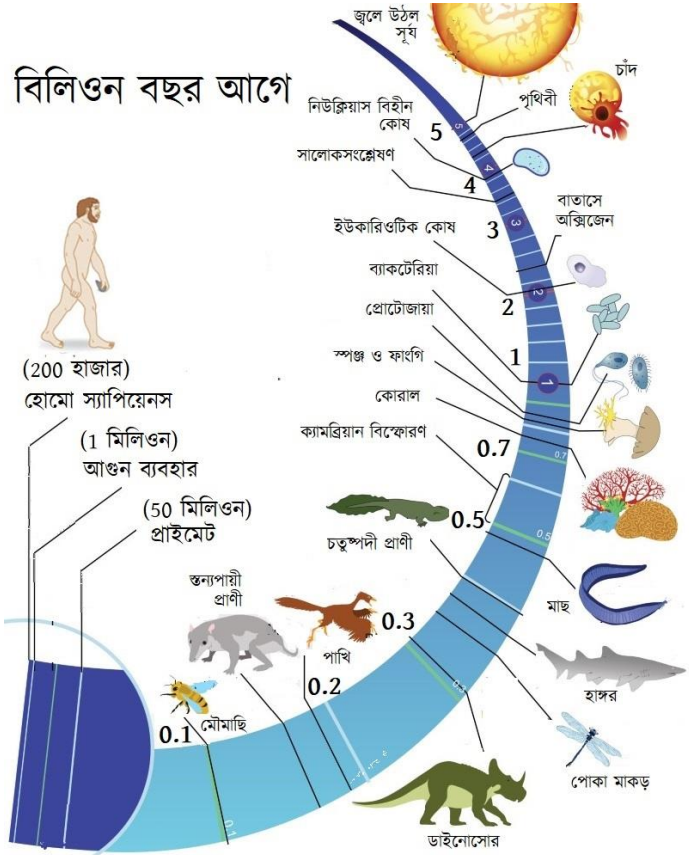

এক নজরে গত 5 বিলিওন বছরের ইতিহাস।

হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুইশত হাজার বছর আগে! তার সন্তান হিসেবে এখন আমরা সবাই বিমূর্ত চিন্তা করতে পারি, গান গাইতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, ভালোবাসতে পারি।

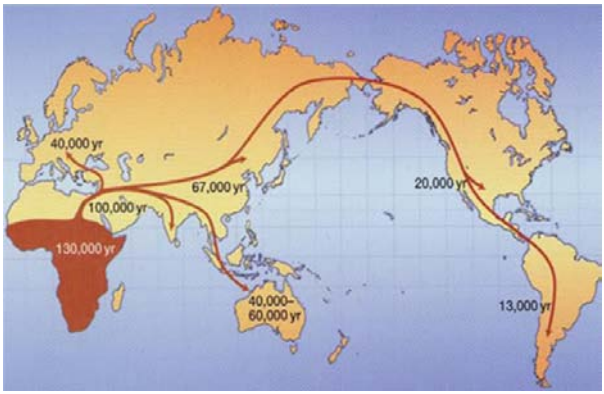

আফ্রিকা থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে হোমো স্যাপিয়েনস।

সমস্ত পৃথিবী থেকে মানুষের অন্য সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর হোমো স্যাপিয়েনসরা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আফ্রিকা থেকে শুরু করে এশিয়া পার হয়ে চীন হয়ে আলাস্কার ভেতর দিয়ে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে। এখন সমুদ্র এই দুই মহাদেশকে আলাদা করে রেখেছে, আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে সেটি কিন্তু শক্ত মাটিতে যুক্ত ছিল। উত্তর আমেরিকা হয়ে হোমো স্যাপিয়েনসরা দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্তে পৌঁছায় মাত্র 13 হাজার বছর আগে।

এখানে একটা বিষয় কিন্তু লক্ষ করার মত। হোমো স্যাপিয়েনসরা পৃথিবীর যেখানেই বসতি তৈরি করেছে, সেখানেই কিন্তু একটা সর্বনাশ করে গেছে। তারা অবলা পশু থেকে অনেক

বুদ্ধিমান, তাই তারা তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে পশুদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। কোথাও কোথাও প্রাণীদের একেবারে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। যেরকম ম্যামথ নামে হাতির মতো একটি অতিকায় প্রাণী মানুষের কারণে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

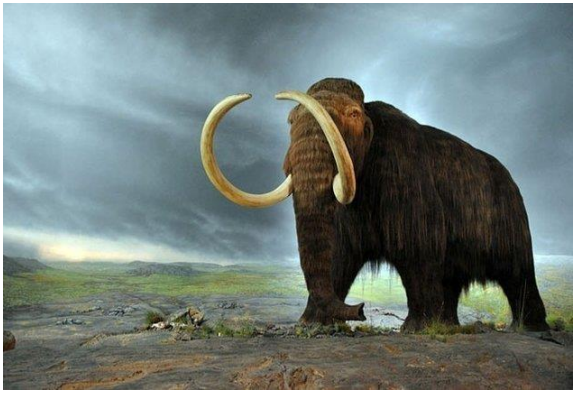

হোমো স্যাপিয়েনসরা পৃথিবীর যেখানেই বসতি করেছে, সেখানকার জীবজগতেরই ভয়াবহ বিপর্যয় করেছে। ম্যামথ বিলুপ্ত হয়েছে মানুষের হাতে।

নক্ষত্রের সন্তান

এই বেলা তোমাদের অত্যন্ত চমকপ্রদ একটা কথা বলি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমার শরীরের কোষগুলো তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এরকম অসংখ্য মৌলিক পদার্থ দিয়ে। এই মৌলগুলো তো পৃথিবীতে কোনোভাবে তৈরি হতে পারেনি, তাহলে সেগুলো পৃথিবীতে কোথা থেকে এসেছে? এই মৌলগুলো তৈরি হতে পারে শুধুমাত্র কোনো একটা নক্ষত্রের ভেতর, কাজেই আমাদের

শরীরে যে ভারী মৌলগুলো আছে সেগুলো এসেছে কোনো একটা নক্ষত্রের ভেতর থেকে। কোনো একটা নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণে এটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারপর সেখান থেকে পৃথিবীতে এসে আমদের দেহে স্থান নিয়েছে।

কাজেই তুমি সবসময় মনে রাখবে, তুমি কিন্তু মোটেও তুচ্ছ একজন মানুষ নও, তুমি হচ্ছ নক্ষত্রের সন্তান! তোমার শরীরে নক্ষত্রের অংশ রয়েছে, যার শরীরে নক্ষত্রের অংশ রয়েছে, সে কী কখনো ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দৈন্যতা দেখাতে পারে?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যত

হোমোস্যাপিয়েনসের ভবিষ্যৎ হয়তো আমরা নিজের চোখেই দেখব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ কিন্তু আমরা দেখব না। বিজ্ঞানীরা অবশ্যি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ কী সেটি এর মাঝে বের করে ফেলেছেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে সেটি আমরা জানি। এই প্রসারণ কী চলতেই থাকবে না কী এক সময় থেমে আবার

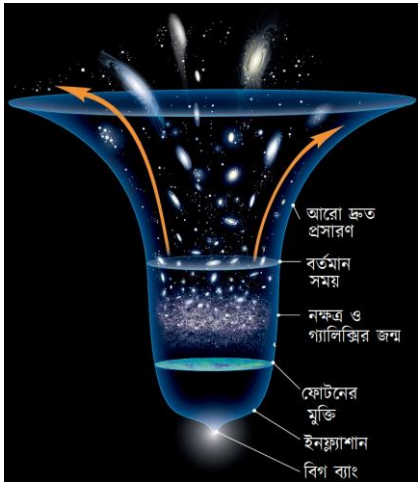

ডার্ক এনার্জির কারনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু প্রসারিতই হতে থাকবে, কখনোই থামবে না।

সংকুচিত হয়ে যাবে সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের এক সময় সংশয় ছিল। এখন আর সেটা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। বিজ্ঞানীরা সুপারনোভা বিস্ফোরণের কিছু চমকপ্রদ পর্যবেক্ষণ থেকে নিশ্চিত হয়েছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংকুচিত হবে না। এটি যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে সেভাবেই প্রসারিত হতে থাকবে, শুধু তাই নয় প্রসারণের গতি আরো বাড়তে থাকবে। সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারণ এতই বেড়ে যাবে যে একটি গ্যালাক্সি থেকে আর অন্য গ্যালাক্সিকে আর দেখাই যাবে না। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের মনে হবে আমাদের চারপাশে আর কেউ নেই।

একা, আমরা একেবারেই একা!

হোমো স্যাপিয়েনসের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে এখন সাত বিলিওন হোমো স্যাপিয়েনস। বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষকে এখানে পৌঁছাতে মিলিওন মিলিওন বছর লেগেছে। মাত্র একশ হাজার বছর আগে বিবর্তিত হওয়া হোমো স্যাপিয়েনস এখন নিজেই বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে। যে পরিবর্তনটুকু করার জন্যে আগে মিলিওন বছর লাগত আজকের হোমো স্যাপিয়েনস সেটি কয়েক বছরে করে ফেলে! তাই আমরা অদূর ভবিষ্যতে কী রকম হোমো স্যাপিয়েনস দেখব সেটি কি আমরা এখন কল্পনা করতে পারব?

ভবিষ্যৎ কল্পনা করা খুব কঠিন কিন্তু তারপরেও আমরা চেষ্টা করি।

মানুষ বানরকেও ক্লোন করে ফেলেছে। শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের জিনের মিল 99.9% কাজেই বিজ্ঞানীরা আসলে এখন ইচ্ছে করলেই মানুষকে ক্লোন করতে পারবে! সেটি করছে না পৃথিবীর নৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্যে। আগে হোক পরে হোক সেটি ঘটে

যাবে! বড় বিজ্ঞানী, বড় গায়ক, বড় শিল্পী বড় খেলোয়াড়কে ক্লোন করা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।



ভবিষ্যতে এই হোমো স্যাপিয়েনস কি আমাদের পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে?

ক্লোন করার নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে কিন্তু জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে একজন সুপার মানব সন্তান জন্মানোতে নিশ্চয়ই সেরকম নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকবে না! তাই আমরা নিশ্চয়ই দেখব পৃথিবীতে সুপার মানব সন্তান জন্ম নিচ্ছে, ভবিষ্যতে সারা পৃথিবী কী সাধারণ মানবসন্তান এবং সুপার মানব সন্তানে বিভক্ত হয়ে যাবে?

আমরা নিজের চোখেই দেখেছি যে মানুষের কুড়ি বছরের বেশি বেঁচে থাকার কথা নয় রোগ শোককে নিয়ন্ত্রণ করে এখন তারা অবলীলায় আশি বছর নব্বই বছর বেঁচে আছে। মানুষের ক্রোমোজোমে পরিবর্তন করে আমরা অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাব মানুষ বার্ধক্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে গেছে! রোগে শোকে একসিডেন্টে মৃত্যুবরণ না করলে কেউ আর মারা যাচ্ছে না! পৃথিবীতে আর শিশু নেই শুধু শত সহস্র বছরের যুবা পুরুষ রমণী। কী সর্বনাশ!



নাকী উপহার দেবে নতুন প্রজন্মের জন্যে নতুন পৃথিবী।

তবে আমাদের সবচেয়ে বড় ঝুকি হচ্ছে মানুষের প্রতি মাননুষের অবিশ্বাস, মানুষের অবহেলা। পৃথিবীতে এখন এতো নিউক্লিয়ার বোমা রয়েছে যে মানুষ অসংখ্যবার পুরো পৃথিবীটাকে পুরোপুরি ধংস করে পুরো মানব জাতিকে বিলুপ্ত করে ফেলতে পারবে। আমরা কী সত্যি পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলব, নাকী নক্ষত্রের সন্তান হিসেবে আমাদের মানুষের জন্যে মানুষের ভালোবাসাই জয়ী হবে এবং আমরা নতুন প্রজন্মকে একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে পারব?